সীমান্ত-হীরা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

সীমান্ত-হীরা ০১ 2
সীমান্ত-হীরা ০২ 16
সীমান্ত-হীরা ০৩ 24
সীমান্ত-হীরা ০৪ 31
সীমান্ত-হীরা ০৫ 38

সীমান্ত-হীরা ০১

কিছুদিন যাবৎ ব্যোমকেশের হাতে কোন কাজকর্ম ছিল না। এদেশের লোকের কেমন বদ অভ্যাস, ছোটখাটো চুরি চামারি হইলে বেবাক হজম করিয়া যায়, পুলিশে পর্যন্ত খবর দেয় না। হয়তো তাহারা ভাবে সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। নেহাত যখন গুরুতর কিছু ঘটিয়া যায় তখন সংবাদটা পুলিশ পর্যন্ত পৌঁছায় বটে কিন্তু গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া বেসরকারি গোয়েন্দা নিযুক্ত করিবার মতো উদ্যোগ বা আগ্রহ কাহারও দেখা যায় না। কিছু দিন হা হুতাশ ও পুলিশকে গালিগালাজ করিয়া অবশেষে তাহারা ক্ষান্ত হয়।

খুন জখম ইত্যাদিও যে আমাদের দেশে হয় না, এমন নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে বুদ্ধি বা চতুরতার লক্ষণ লেশমাত্র দেখা যায় না; রাগের মাথায় খুন করিয়া হত্যাকারী তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া যায় এবং সরকারের পুলিশ তাহাকে হাজতজাত করিয়া অচিরাৎ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়।

সুতরাং সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের পক্ষে সত্য অন্বেষণের সুযোগ যে বিরল হইয়া পড়িবে ইহা বিচিত্র নহে। ব্যোমকেশের অবশ্য সেদিকে লক্ষই ছিল না, সে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে শেষ পৃষ্ঠার দক্ষিণ পূর্ব কোণ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়া বাকি সময়টুকু নিজের লাইব্রেরি ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাটাইয়া দিতেছিল। আমার কিন্তু এই একটানা অবকাশ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যদিচ অপরাধীর অনুসন্ধান করা আমার কাজ নহে, গল্প লিখিয়া বাঙালি পাঠকের চিত্তবিনোদনরূপ অবৈতনিক

কার্যকেই জীবনের ব্রত করিয়াছি, তবু চোর ধরার যে একটা অপূর্ব মাদকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নেশার বস্তুর মতো এই উত্তেজনার উপাদান যথাসময় উপস্থিত না হইলে মন একেবারে বিকল হইয়া যায় এবং জীবনটাই লবণহীন ব্যঞ্জনের মতো বিস্বাদ ঠেকে।

তাই সেদিন সকালবেলা চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশকে বলিলাম, "কি হে বাংলাদেশের চোর ছ্যাঁচড়গুলো কি সব সাধু সন্ন্যাসী হয়ে গেল না কি?"
ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, "না। তার প্রমাণ তো খবরের কাগজে রোজ পাচ্ছ।"
"তা তো পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কাছে আসছে কৈ?"
"আসবে। চারে যখন মাছ আসবার তখনি আসে, তাকে জোর করে ধরে আনা যায় না। তুমি কিছু অধীর হয়ে পড়েছ দেখছি। ধৈর্যং রহু। আসল কথা আমাদের দেশে প্রতিভাবান বদমায়শ — প্যারাডক্স হয়ে যাচ্ছে, কি করব; দোষ আমার নয়, দোষ তোমাদের দীনহীনা পিঁচুটি নয়না বঙ্গভাষায় – প্রতিভাবান বদমায়েশ খুব অল্পই আছে। পুলিশ কোর্টের রিপোর্টে যাদের নাম দেখতে পাও, তারা চুনোপুঁটি। যাঁরা গভীর জলের মাছ – তাঁরা কদাচিৎ চারে এসে ঘাই মারেন। আমি তাঁদেরই খেলিয়ে তুলতে চাই। জানো তো যে পুকুরে দু'চারটে বড় বড় রুই কাতলা আছে সেই পুকুরে ছিপ ফেলেই শিকারির আনন্দ।"

আমি বলিলাম, "তোমার উপমাগুলো থেকে বেজায় আঁশটে গন্ধ বেরুচ্ছে। মনস্তত্ত্ববিদ যদি কেউ এখানে থাকতেন, তিনি নির্ভয়ে বলে দিতেন যে তুমি সত্যান্বেষণ ছেড়ে শীঘ্রই মাছের ব্যবসা আরম্ভ করবে।"

ব্যোমকেশ বলিল, "তাহলে মনস্তত্ত্ববিদ মহাশয় নিদারুণ ভুল করতেন। যে লোক মাছের সম্বন্ধে গবেষণা করে, সে জলচর জীবের কখনও নাম শোনেনি – এই হচ্ছে আজকালকার নতুন বিধি। তোমরা আধুনিক গল্প লেখকের দল এই কথটাই আজকাল প্রমাণ করছ।"

আমি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম, "ভাই, আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই, প্রতিদানের আশা না করে শুধু আনন্দ যোগাই, তবু কি তোমাদের মন ওঠে না? এর বেশি যদি চাও তাহলে নগদ কিছু ছাড়তে হবে।"

দরজার কড়া নাড়িয়া "চিঠি হ্যায়" বলিয়া ডাক পিওন প্রবেশ করিল। আমাদের জীবনে ডাক পিওনের সমাগম এতই অপ্রচুর যে, মুহূর্তমধ্যে সাহিত্যিক দুঃখ দীনতা ভুলিয়া গেলাম। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একখানা ইঙ্গিওর করা খাম ব্যোমকেশের নামে আসিয়াছে।

খাম ছিঁড়িয়া ব্যোমকেশ যখন চিঠি বাহির করিল তখন কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। ব্রঞ্জ ব্লু কালিতে ছাপা মনোগ্রাম যুক্ত পুরু কাগজে লেখা চিঠি এবং সেই সঙ্গে পিন দিয়া আঁটা একটি একশ টাকার নোট। চিঠিখানি ছোট; ব্যোমকেশ পড়িয়া সহাস্য মুখে আমার হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও। গুরুতর ব্যাপার। উত্তরবঙ্গের বনিয়াদী জমিদার গৃহে রোমাঞ্চকর রহস্যের আবির্ভাব। সেই রহস্য উদ্ঘাটিত করবার জন্য জোর তাগাদা এসেছে – পত্রপাঠ যাওয়া চাই। এমন কি, একশ টাকা অগ্রিম রাহাখরচ পর্যন্ত এসে হাজির।"

চিঠির শিরোনামায় কোনও এক বিখ্যাত জমিদারি স্টেটের নাম। জমিদার স্বয়ং চিঠি লেখেন নাই, তাঁহার সেক্রেটারি ইংরাজিতে টাইপ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম এই,

প্রিয় মহাশয়,
কুমার শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, তিনি আপনার নাম শুনিয়াছেন। একটি বিশেষ জরুরি কার্যে তিনি আপনার সাহায্য ও পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করেন। অতএব আপনি অবিলম্বে এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। পথ খরচের জন্য ১০০ টাকার নোট এই সঙ্গে পাঠাইলাম। আপনি কোন ট্রেনে আসিতেছেন, তার যোগে জানাইলে স্টেশনে গাড়ি উপস্থিত থাকিবে।
ইতি –

পত্র হইতে আর কোনও তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, "তাই তো হে, ব্যাপার সত্যই গুরুতর ঠেকছে। জরুরি কার্যটি কি – চিঠির কাগজ বা ছাপার হরফ থেকে কিছু অনুমান করতে পারলে? তোমার তো ও সব বিদ্যে আছে।"

"কিছু না। তবে আমাদের দেশের জমিদার বাবুদের যতদূর জানি, খুব সম্ভব কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন যে, তাঁর পোষা হাতিটি পাশের জমিদার চুরি করে নিয়ে গেছে; তাই শঙ্কিত হয়ে তিনি গোয়েন্দা তলব করেছেন।"

"না না, অতটা নয়। দেখছ না একেবারে গোড়াতেই এতগুলো টাকা খরচ করে ফেলেছে। ভেতরে নিশ্চয় কোনও বড় রকম গোলমাল আছে।"

"ঐটে তোমাদের ভুল; বড় লোক রুগী হলে মনে কর ব্যাধিও বড় রকম হবে। দেখা যায় কিন্তু ঠিক তার উল্টো। বড়লোকের ফুসকুড়ি হলে ডাক্তার আসে, কিন্তু গরীবের একেবারে নাভিশ্বাস না উঠলে ডাক্তার বৈদ্যের কথা মনেই পড়ে না।"

"যা হোক,কি ঠিক করলে? যাবে না কি?"

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, "হাতে যখন কোনও কাজ নেই, তখন চল দুদিনের জন্যে ঘুরেই আসা যাক। আর কিছু না হোক, নূতন দেশ দেখা তো হবে। তুমিও বোধ হয় ও অঞ্চলে কখনও যাওনি।"

যদিচ যাইবার ইচ্ছা ষোল আনা ছিল তবু ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলাম, "আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তোমাকে ডেকেছে -"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, "দোষ কি? একজনের বদলে দু'জন গেলে কুমার বাহাদুর বরঞ্চ খুশিই হবেন। ধনক্ষয় যখন অন্যের হচ্ছে, তখন যাওয়াটা তো একটা কর্তব্যবিশেষ। শাস্ত্রে লিখেছে – সর্বদা পরের পয়সায় তীর্থ দর্শন করবে।"

কোন শাস্ত্রে এমন জ্ঞানগর্ভ নীতি উপদেশ আছে যদিও স্মরণ করিতে পারিলাম না, তবু সহজেই রাজি হইয়া গেলাম।

সেইদিন সন্ধ্যার গাড়িতে যাত্রা করিলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটিল না, শুধু একটি অত্যন্ত মিশুক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় আমরা তিনজন ছাড়া আর কেহ ছিল না, একথা সেকথার পর ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশাইদের কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে?"

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মশাইয়ের কদ্দুর যাওয়া হবে?"

পালটা প্রশ্নে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হইয়া থাকিয়া ভদ্রলোকটি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, “আমি – এই পরের স্টেশনেই নামব।”
ব্যোমকেশ পূর্ববৎ মধুর স্বরে বলিল, “আমরাও তার পরের স্টেশনে নেমে যাব।”

অহেতুক মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ব্যোমকেশের কোনও মতলব আছে বুঝিয়া আমি কিছু বলিলাম না। গাড়ি থামিতেই ভদ্রলোক নমিয়া গেলেন। রাত্রি হইয়াছিল, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে তিনি নিমেষমধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেলেন, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

দুই তিন স্টেশন পরে জানালার কাচ নামাইয়া বাহিরে গলা বাড়াইয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম, পাশের একটা ইন্টার ক্লাশের কামরায় জানালায় মাথা বাহির করিয়া ভদ্রলোকটি আমাদের গাড়ির দিকেই তাকাইয়া আছেন। চোখাচোখি হইবামাত্র তিনি বিদ্যুদ্বেগে মাথা টানিয়া লইলেন। আমি উত্তেজিতভাবে ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, “ওহে -”
ব্যোমকেশ বলিল, “জানি। ভদ্রলোক পাশের গাড়িতে উঠেছেন। ব্যাপার যতটা তুচ্ছ মনে করেছিলুম, দেখছি তা নয়। ভালোই!”
তারপর প্রায় প্রতি স্টেশনেই জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সে ভদ্রলোকের চুলের টিকি পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম। স্টেশনটি ছোট, সেখান হইতে প্রায় ছয় সাত মাইল মোটরে যাইতে হইবে। একখানি দামি মোটর লইয়া জমিদারের

একজন কর্মচারি উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা মোটরে বসিলাম। অতঃপর নির্জন পথ দিয়া মোটর নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিল।

কর্মচারিটি প্রবীণ এবং বিচক্ষণ; ব্যোমকেশ কৌশলে তাঁহাকে দু'একটি প্রশ্ন করিতেই তিনি বলিলেন, "আমি কিছুই জানি না, মশাই! শুধু আপনাদের স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম পেয়েছিলাম, তাই নিয়ে যচ্ছি।"

আমরা মুখ তাকাতাকি করিলাম, আর কোনও কথা হইল না। পরে জমিদারভবনে পৌঁছিয়া দেখিলাম, সে এক এলাহি কাণ্ড! মাঠের মাঝখানে যেন ইন্দ্রপুরী বসিয়াছে। প্রকাণ্ড সাবেক পাঁচমহল ইমারত – তাহাকে ঘিরিয়া প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমির উপর বাগান, হট হাউস, পুষ্করিণী, টেনিস কোর্ট, কাছারি বাড়ি, অতিথিশালা, পোস্ট অফিস, আরও কত কি! চারিদিকে লস্কর পেয়াদা গোমস্তা সরকার খাতক প্রজার ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের মোটর বাড়ির সম্মুখে থামিতেই জমিদারের প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বয়ং আসিয়া আমাদের সমাদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। একটা আস্ত মহল আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেক্রেটারি বলিলেন, "আপনারা মুখ হাত ধুয়ে জলযোগ করে নিন। ততক্ষণ কুমার বাহাদুরও আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তৈরি হয়ে যাবেন।"

স্নানাদি সারিয়া বাহির হইতেই প্রচুর প্রাতঃরাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার যথারীতি ধ্বংস সাধন করিয়া তৃপ্তমনে ধূমপান করিতেছি, এমন সময় সেক্রেটারি আসিয়া বলিলেন, "কুমার বাহাদুর লাইব্রেরি ঘরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। যদি আপনাদের অবসর হয়ে থাকে – আমার সঙ্গে আসুন।"

আমরা উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। রাজসকাশে যাইতেছি, এমনি একটা ভাব লইয়া লাইব্রেরি ঘরে প্রবেশ করিলাম। 'কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ' নাম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিষয়ে বিরাট আড়ম্বর দেখিয়া মনের মধ্যে কুমার বাহাদুর সম্বন্ধে একটা গুরুগম্ভীর ধারণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। দেখিলাম, আমাদেরই মতো সাধারণ পাঞ্জাবি পরা একটি সহস্যমুখ যুবাপুরুষ, গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা – ব্যবহারে তিলমাত্র আড়ম্বর নাই। আমরা যাইতেই চেয়ার হইতে উঠিয়া আগেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। পলকের জন্য একটু দ্বিধা করিয়া ব্যোমকেশকে বলিলেন, "আপনিই ব্যোমকেশবাবু? আসুন।"

ব্যোমকেশ আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিল, "ইনি আমার বন্ধু, সহকারী এবং ভবিষ্যৎ জীবনী লেখক।"
কুমার ত্রিদিব হাসিয়া কহিলেন, "আশা করি, আপনার জীবনী লেখার প্রয়োজন এখনও অনেক দূরে। অজিতবাবু এসেছেন, আমি ভারি খুশি হয়েছি। কারণ, প্রধানত ওঁর লেখার ভিতর দিয়েই আপনার নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।"

উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অন্যের মুখে নিজের লেখার অযাচিত উল্লেখ যে কত মধুর, তাহা যিনি ছাপার অক্ষরের কারবার করেন, তিনিই জানেন। বুঝিলাম, ধনী জমিদার হইলেও লোকটি অতিশয় সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। লাইব্রেরি ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম দেয়াল সংলগ্ন আলমারিগুলি দেশি বিলাতি নানা প্রকার পুস্তকে ঠাসা। টেবিলের উপরেও অনেকগুলি বই ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। লাইব্রেরি ঘরটি যে কেবল মাত্র

জমিদার গৃহের শোভাবর্ধনের জন্য নহে, রীতিমতো ব্যবহারের জন্য – তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

আরও কিছুক্ষণ শিষ্টতা বিনিময়ের পর কুমার বাহাদুর বলিলেন, “এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।”

সেক্রেটারিকে হুকুম দিলেন, “তুমি এখন যেতে পার। লক্ষ রেখো, এ ঘরে কেউ না ঢোকে।”

সেক্রেটারি সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে কুমার ত্রিদিব চেয়ারে ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিলেন, “আপনাদের যে কাজের জন্য এত কষ্ট দিয়ে ডেকে আনিয়েছি, সে কাজ যেমন গুরুতর, তেমনি গোপনীয়। তাই সকল কথা প্রকাশ করে বলবার আগে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হবে না। এত সাবধানতার কারণ, এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বংশের মর্যাদা জড়ানো রয়েছে।”

ব্যোমকেশ বলিল, “প্রতিশ্রুতি দেবার কোনও দরকার আছে মনে করিনে, একজন মক্কেলের গুপ্তকথা অন্য লোককে বলা আমাদের ব্যবসার রীতি নয়। কিন্তু আপনি যখন প্রতিশ্রুতি চান, তখন দিতে কোনও বাধাও নেই। কি ভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বলুন।”

কুমার হাসিয়া বলিলেন, “তামা তুলসীর দরকার নেই। আপনাদের মুখের কথাই যথেষ্ট।”

আমি একটু দ্বিধায় পড়িলাম, বলিলাম, “গল্পচ্ছলেও কি কোনও কথা প্রকাশ করা চলবে না?”

কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, “না। এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনাই চলবে না।”

হয়তো একটা ভালো গল্পের মশলা হাত ছাড়া হইয়া গেল, এই ভাবিয়া মনে মনে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, "আপনি নির্ভয়ে বলুন। আমরা কোনও কথা প্রকাশ করব না।"

কুমার ত্রিদিব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, যেন কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবেন তাহাই ভাবিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, "আমাদের বংশে যে সব সাবেক কালের হীরা জহরত আছে সে সম্বন্ধে বোধ হয়া আপনি কিছু জানেন না – "

ব্যোমকেশ বলিল, "কিছু কিছু জানি। আপনাদের বংশে একটি হীরা আছে, যার তুল্য হীরা বাংলা দেশে আর দ্বিতীয় নেই – তার নাম সীমন্ত হীরা।"

ত্রিদিব সাগ্রহে বলিলেন, "আপনি জানেন? তাহলে এ কথাও জানেন বোধ হয় যে গতমাসে কলকাতায় যে রত্ন প্রদর্শনী হয়েছিল, তাহাতে ঐ হীরা দেখানো হয়েছিল?"

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "জানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে হীরা চোখে দেখার সুযোগ হয়নি।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কুমার কহিলেন, "সে সুযোগ আর কখনও হবে কি না জানি না। হীরাটা চুরি গেছে।"

ব্যোমকেশ প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল, "চুরি গেছে!"

শান্তকণ্ঠে কুমার বলিলেন, "হঁযা, সেই সম্পর্কেই আপনাকে আনিয়েছি। ঘটনাটা শুরু থেকে বলি শুনুন। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের এই জমিদার বংশ অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। বারো ভুঁইয়ারও আগে পাঠান বাদশাদের আমলে আমাদের আদি পূর্বপুরুষ এই জমিদারি অর্জন করেন। সাদা কথায় তিনি একজন দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার ছিলেন, নিজের বাহুবলে সম্পত্তি লাভ করে পরে বাদশার কাছ থেকে সনন্দ

আদায় করেন। সে বাদশাহি সনন্দ এখনও আমাদের কাছে বর্তমান আছে। এখন আমাদের অনেক অধঃপতন হয়েছে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে আমাদের 'রাজা' উপাধি ছিল।"

"ঐ 'সীমন্ত হীরা' আমাদের পূর্বপুরুষের সময় থেকে পুরুষানুক্রমে এই বংশে চলে আসছে। একটা প্রবাদ আছে যে, এই হীরা যতদিন আমাদের কাছে থাকবে, ততদিন বংশের কোনও অনিষ্ট হবে না; কিন্তু হীরা কোনও রকমে হস্তান্তরিত হলেই এক পুরুষের মধ্যে বংশ লোপ হয়ে যাবে।"

একটু থামিয়া কুমার আবার বলিতে লাগিলেন, "জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র জমিদারির উত্তরাধিকারী হয়, এই হচ্ছে আমাদের বংশের চিরাচরিত লোকাচার। কনিষ্ঠরা কেবল বাবুয়ান বা ভরণপোষণ পান। এই সূত্রে দু'বছর আগে আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি জমিদারি পেয়েছি। আমি বাপের একমাত্র সন্তান, উপস্থিত আমার এক কাকা আছেন, তিনি বাবুয়ানস্বরূপ তিন হাজার টাকা মাসিক খোরপোষ জমিদারি থেকে পেয়ে থাকেন।

এ তো গেল গল্পের ভূমিকা। এবার হীরা চুরির ঘটনাটা বলি। রত্ন প্রদর্শনীতে আমার হীরা একজিবিট করবার নিমন্ত্রণ যখন এল, তখন আমি নিজে স্পেশাল ট্রেনে করে সেই হীরা নিয়ে কলকাতা গেলাম; কলকাতায় পৌঁছে হীরাখানা প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করে দেবার পর তবে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনারা জানেন প্রদর্শনীতে বরোদা, হায়দ্রাবাদ, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজবংশের খানদানি জহরত প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রদর্শনের কর্তা ছিলেন স্বয়ং গভর্নমেন্ট, সুতরাং সেখান থেকে হীর চুরি যাবার কোনও ভয় ছিল না। তা ছাড়া যে গ্লাসকেসে আমার হীরা রাখা হয়েছিল, তার চাবি কেবল আমারই কাছে ছিল।

সাতদিন একজিবিশন চলল। আট দিনের দিন আমার হীরা নিয়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি ফিরে এসে জানতে পারলাম যে আমার হীরা চুরি গেছে, তার বদলে যা ফিরিয়ে এনেছি, তা দু'শ টাকা দামের মেকি পেস্ট।"

কুমার চুপ করিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, "চুরিটা ধরা পড়বার পর প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে কিংবা পুলিশকে খবর দেননি কেন?"

কুমার বলিলেন, "খবর দিয়ে কোনও লাভ হত না, কারণ কে চুরি করেছে, চুরি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা জানতে পেরেছিলাম।"

"ওঃ" – ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তারপর বলে যান।"

কুমার বলিতে লাগিলেন, "এ কথা কাউকে বলবার নয়। পাছে জানাজানি হয়ে পারিবারিক কলঙ্ক বার হয়ে পড়ে, খবরের কাগজে এই নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়ে যায়, এই ভয়ে বাড়ির লোককে পর্যন্ত একথা জানাতে পারি নি। জানি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়।"

"কথাটা আরও খোলসা করে বলা দরকার। পূর্বে বলেছি, আমার এক কাকা আছেন। তিনি কলকাতায় থাকেন, স্টেট থেকে মাসিক তিন হাজার টাকা খরচা পান। তাঁর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন, তিনিই বিখ্যাত শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণ রায়। তাঁর মতো আশ্চর্য মানুষ খুব কম দেখা যায়। বিলেতে জন্মালে তিনি বোধ হয় অদ্বিতীয় মনীষী বলে পরিচিত হতে পারতেন। যেমন তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তেমনই অগাধ পাণ্ডিত্য। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস সম্বন্ধে কি একটা তথ্য

আবিষ্কার করে ইংরাজ গভর্নমেণ্টকে উপহার দিয়েছিলেন – তার ফলে 'স্যর' উপাধি পান। শিল্পের দিকেও তাঁর কি অসামান্য প্রতিভা, তার পরিচয় সম্ভবত আপনাদের অল্পবিস্তর জানা আছে। প্যারিসের শিল্প প্রদর্শনীতে মহাদেবের প্রস্তরমূর্তি একজিবিট করে তিনি যে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেন, তা কারুর অবিদিত নেই। মোটের পর এমন বহুমুখী প্রতিভা সচরাচর চোখে পড়েনা।" বলিয়া কুমার বাহাদুর একটু হাসিলেন।

আমরা নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। কুমার বলিতে লাগিলেন, "কাকা আমাকে কম স্নেহ করেন না, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছিল। ঐ হীরাটা তিনি আমার কাছে চেয়েছিলেন। হীরাটার উপর তাঁর একটা অহেতুক আসক্তি ছিল। তার দামের জন্য নয়, শুধু হীরাটাকেই নিজের কাছে রাখবার জন্যে তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হীরাটার দাম কত হবে?"

কুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "খুব সম্ভব তিন পয়জার। টাকা দিয়ে সে জিনিস কেনবার মত লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। তা ছাড়া আমরা কখনও তার দাম যাচাই করে দেখিনি। গৃহদেবতার মতোই সে হীরাটা অমূল্য ছিল। সে যাক। আমার বাবার কাছেও কাকা ঐ হীরাটা চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবা দেননি। তারপর বাবা মারা যাবার পর কাকা আমার কাছে সেটা চাইলেন। বললেন, 'আমার মাসহারা চাই না, তুমি শুধু আমায় হীরাটা দাও।' বাবা মৃত্যুকালে আমাকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাই জোড়হাত করে কাকাকে বললাম, 'কাকা, আপনার আর যা ইচ্ছা নিন, কিন্তু ও হীরাটা দিতে পারব না। বাবার শেষ আদেশ।' কাকা আর কিছু বললেন না, কিন্তু বুঝলাম, তিনি আমার উপর মর্মান্তিক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারপর থেকে কাকার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।

তবে পত্র ব্যবহার হয়েছে। যেদিন হীরা নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এলাম, তার পরদিন কাকার কাছ থেকে এক চিঠি এল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু পড়ে মাথা ঘুরে গেল। এই দেখুন সে চিঠি।”

সীমান্ত-হীরা ০২

চাবি দিয়া সেক্রেটারিয়ট টেবিলের দেরাজ খুলিয়া কুমার বাহাদুর একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিলেন। ছোট ছোট সুছাঁদ অক্ষরে লেখা বাঙলা চিঠি, তাহাতে লেখা আছে,

কল্যাণীয় খোকা,
দুঃখিত হয়ো না। তোমরা দিতে হাওনি, তাই আমি নিজের হাতেই নিলাম। বংশলোপ হবে বলে যে কুসংস্কার আছে, তাতে বিশ্বাস করো না। ওটা আমাদের পূর্বপুরুষদের একটা ফন্দি মাত্র, যাতে জিনিসটা হস্তান্তরিত করতে কেউ সাহস না করে। আশীর্বাদ নিও।
ইতি
তোমার কাকা
শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ রায়

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চিঠি ফেরত দিল। কুমার বলিতে লাগিলেন, "চিঠি পড়েই ছুটলাম তোষাখানায়। লোহার সিন্দুক খুলে হিরের বাক্স বার করে দেখলাম, হীরা ঠিক আছে। দেওয়ান মশায়কে ডাকলাম, তিনি জহরতের একজন ভালো জহুরি, দেখেই বললেন, জাল হীরা। কিন্তু চেহারায় কোথাও এতটুকু তফাত নেই, একেবারে অবিকল আসল হীরার জোড়া।"

কুমার দেরাজ খুলিয়া একটি ভেলভেটের বাক্স বাহির করিলেন। ডালা খুলিতেই সুপারির মতো গোলাকার একটা পাথর আলোকসম্পাতে ঝকমক করিয়া উঠিল। কুমার বাহাদুর দুই আঙুলে সেটা তুলিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন, "জহুরি ছাড়া কারুর সাধ্য নেই যে বোঝে এটা ঝুটো। আসলে দুশ টাকার বেশি এর দাম নয়।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা সেই মূল্যহীন কাচখণ্ডটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম; তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ সেটা ফিরাইয়া দিল, বলিল, "তাহলে আমার কাজ হচ্ছে সেই আসল হীরাটা উদ্ধার করা?"

স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কুমার বলিলেন, "হ্যাঁ। কেমন করে হীরা চুরি গেল, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই। আমি শুধু আমার হীরাটা ফেরত চাই। যেমন করে হোক, যে উপায়ে হোক, আমার 'সীমন্ত হীরা' আমাকে ফিরিয়ে এনে দিতে হবে। খরচের জন্যে ভাবনা করবেন না, যত টাকা লাগ, যদি বিশ হাজার টাকা দরকার হয়, তাও দিতে আমি পশ্চাৎপদ হব না জানবেন। শুদু একটি শর্ত, কোনও রকমে এ কথা যেন খবরের কাগজে না ওঠে।"

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে নাগাদ হীরাটা পেলে আপনি খুশি হবেন?"

উত্তেজনায় কুমার বাহাদুরের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "কবে নাগাদ? তবে কি, তবে কি আপনি হীরাটা উদ্ধার করতে পারবেন বলে মনে হয়?"

ব্যোমকেশ হাসিল, বলিল, "এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এর চেয়ে ঢের বেশি জটিল রহস্য প্রত্যাশা করেছিলুম। যা হোক, আজ শনিবার; আগামী শনিবারের মধ্যে আপনার হীরা ফেরত পাবেন।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথম দিনটা গোলমালে কাটিয়া গেল।

রাত্রে দুইজনে কথা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্ল্যান অফ ক্যাম্পেন কিছু ঠিক করলে?"

ব্যোমকেশ বলিল, "না। বাড়িটা দেখে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যাক, তার পর প্ল্যান স্থির করা যাবে।"

"হিরেটা কি বাড়িতেই আছে মনে হয়?"

"নিশ্চয়। যে জিনিসের মোহে খুড়ো মহাশয় শেষ বয়সে ভাইপো'র সম্পত্তি চুরি করেছেন, সে জিনিস তিনি এক দণ্ডের জন্যও কাছ ছাড়া করবেন না। আমাদের শুধু জানা দরকার, কোথায় তিনি সেটা রেখেছেন। আমার বিশ্বাস -"

"তোমার বিশ্বাস?"

"যাক, সেটা অনুমানমাত্র। দিগিন্দ্রনারায়ণ খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছুই ঠিক করে বলা যায় না।"

আমি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম, "আচ্ছা ব্যোমকেশ, এ কাজের নৈতিক দিকটা ভেবে দেখেছ?"

"কোন কাজের?"

"যে উপায় অবলম্বন করে তুমি হিরেটা উদ্ধার করতে যাচ্ছ।"

"ভেবে দেখেছি। ডাহা নিছক চুরি, ধরা পড়লে জেলে যেতে হবে। কিন্তু চুরি মাত্রেই নৈতিক অপরাধ নয়। চোরের পর বাটপাড়ি করা মহা পুণ্যকার্য।"

"তা যেন বুঝলুম, কিন্তু দেশের আইন তো সে কথা শুনবে না।"

"সে ভাবনা আমার নয়। আইনের যাঁরা রক্ষক, তাঁরা পারেন, আমাকে শাস্তি দিন।"

পরদিন দুপুর বেলা ব্যোমকেশ একাকী বাহির হইয়া গেল; যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিতে বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাজ কত দূর হল?"

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে কচুরিতে কামড় দিয়া বলিল, "বিশেষ সুবিধা হল না। বুড়ো একটি হর্তেল ঘুঘু। আর তার একটি নেপালি চাকর আছে, সে বেটার চোখ দুটো ঠিক শিকারি বেড়ালের মতো। যা হোক, একটা সুরাহা হয়েছে, বুড়ো একজন সেক্রেটারি খুঁজছে, দুটো দরখাস্ত করে দিয়ে এসেছি।"

"সব কথা খুলে বল।"

চায়ে চুমুক দিয়া বাটি নামাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, "কুমার বাহাদুর যা বলেছিলেন, তা নেহাত মিথ্যে নয়, খুড়ো মহাশয় অতি পাকা লোক। বাড়িটা নানা রকম বহুমূল্য জিনিসের একটা মিউজিয়াম বললেই হয়; কর্তা একলা থাকেন বটে, কিন্তু অনুগত এবং বিশ্বাসী লোকলস্করের অভাব নেই। প্রথমত বাড়ির কম্পাউণ্ডে ঢোকাই মুস্কিল, ফটকে চারটে দারোয়ান অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বসে আছে, কেউ ঢুকতে গেলেই হাজার রকম প্রশ্ন। পাঁচিল ডিঙিয়ে যে ঢুকবে, তারও উপায় নেই, আট হাত উঁচু পাঁচিল, তার উপর ছুঁচলো লোহার শিক বসানো। যা হোক, কোনও রকমে দারোয়ান বাবুদের খুশি করে ফটকের ভিতর যদি ঢুকলে, বাড়ির সদর দরজায় নেপালি ভৃত্য উজরে সিং থাপা বাঘের মতো থাবা গেড়ে বসে আছেন, ভালোরকম কৈফিয়ত যদি না দিতে পার, বাড়িতে ঢোকবার আশা ঐখানেই ইতি। রাত্রির ব্যবস্থা আরও চমৎকার। দারোয়ান, চৌকিদার তো আছেই, তার উপর চারটে বিলিতি ম্যাস্টিফ কুকুর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছাড়া থাকে। সুতরাং নিশীথ সময়ে নিরিবিলি গিয়ে যে কার্যোদ্ধার করবে সে পথও বন্ধ।"

“তবে উপায়?

“উপায় হয়েছে। বুড়োর একজন সেক্রেটারি চাই – বিজ্ঞাপন দিয়েছে। দেড় শ’টাকা মাইনে – বাড়িতেই থাকতে হবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই এবং শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং ইত্যাদি আরও অনেক রকম সদগুণের আবশ্যক। তাই দুটো দরখাস্ত করে দিয়ে এসেছি, কাল ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে।”

“দুটো দরখাস্ত কেন?”

“একটা তোমার একটা আমার। যদি একটা ফস্কায়, অন্যটা লেগে যাবে।”

পরদিন অর্থাৎ সোমবার সকালবেলা আটটার সময় আমরা স্যর দিগিন্দ্রনরায়ণের ভবনে সেক্রেটারি পদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলাম। শহরের দক্ষিণে অভিজাত পল্লীতে তাঁহার বাড়ি; দারোয়ানের ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, আমাদের মতো আরও কয়েকজন চাকরি অভিলাষী হাজির আছেন। একটা ঘরের মধ্যে সকলে গিয়া বসিলাম এবং বক্রকটাক্ষে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশ ও আমি যে পরস্পরকে চিনি, তাহার আভাসমাত্র দিলাম না। পূর্ব হইতে সেইরূপ স্থির করিয়া গিয়াছিলাম।

বাড়ির কর্তা ভিতরের কোনও একটা ঘরে বসিয়া একে একে উমেদারদিগকে ডাকিতে ছিলেন। মনের মধে উৎকণ্ঠা জাগিতেছিল, হয়তো আমাদের ডাক পড়িবার পূর্বেই অন্য কেহ বহাল হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখা গেল, একে একে সকলেই ফিরিয়া আসিলেন এবং বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া শুষ্ক মুখে প্রস্থান করিলেন। শেষপর্যন্ত বাকি রহিয়া গেলাম আমি আর ব্যোমকেশ।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশ নাম ভাঁড়াইয়া দরখাস্ত করিয়াছিল; আমার নতুন নামকরণ হইয়াছিল জিতেন্দ্রনাথ এবং ব্যোমকেশের নিখিলেশ। পাছে ভুলিয়া যাই, তাই নিজের নামটা মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া লইতেছিলাম, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল কর্তা আমাদের দুইজনকে একসঙ্গে তলব করিয়াছেন। কিছু বিস্মিত হইলাম। ব্যাপার কি? এতক্ষণ তো একে একে ডাক পড়িতেছিল, এখন আবার একসঙ্গে কেন? যাহা হোক, বিনা বাক্যব্যায়ে ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখীন হইলাম।

প্রায় আসবাবশূন্য প্রকাণ্ড একখানা ঘরের মাঝখানে বৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং তাহারই সম্মুখে দরজার দিকে মুখ করিয়া হাতকাটা পিরান পরিহিত বিশালকায় স্যর দিগিন্দ্র বসিয়া আছেন। বুলডগের মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ গজাইলে যে রকম দেখিতে হয়, সেই রকম একখানা মুখ – হঠাৎ দেখিলে 'বাপ রে' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। হাঁড়ির মতো মাথা, তাহার মধ্যস্থলে টাক পড়িয়া খানিকটা স্থান চকচকে হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড শরীর এবং প্রকাণ্ড মস্তকের মাঝখানে গ্রীবা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। দীর্ঘ রোমশ বাহু দুটা বনমানুষের মতো দৃঢ় এবং ভয়ঙ্কর; কিন্তু তাহার প্রান্তে আঙুলগুলি 'ভারতীয় চিত্রকলার' মতো সরু ও সুদৃশ্য, একেবারে লতাইয়া না গেলেও পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র এবং সর্বদাই যেন লড়াই করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজিতেছে। মোটের উপর আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মতো এই লোকটিকে দেখিবামাত্র একটা অহেতুক সম্ভ্রম ও ভীতির সঞ্চার হয়, মনে হয়, ইহার ঐ কুদর্শন দেহটার মধ্যে ভালো ও মন্দ করিবার অফুরন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে।

আমরা বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া টেবিলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেই ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি আমার মুখ হইতে ব্যোমকেশের মুখে দ্রুতবেগে কয়েকবার যাতায়াত করিয়া ব্যোমকেশের মুখের পর স্থির হইল। তারপর এই প্রকাণ্ড মুখে এক অদ্ভুত হাসি দেখা দিল। বুলডগ হাসিতে পারে কি না জানি না; কিন্তু পারিলে বোধ করি ঐ রকমই হাসিত। এই হাস্য ক্রমে মিলাইয়া গেলে জলদগম্ভীর শব্দ হইল, "উজরে দরজা বন্ধ করে দাও।"

নেপালি ভৃত্য উজরে সিং দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশব্দে বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কর্তা তখন টেবিলের উপর হইতে আমাদের দরখাস্ত দুইটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "কার নাম নিখিলেশ?"

ব্যোমকেশ বলিল, "আজ্ঞে আমার।"

কর্তা কহিলেন, "হুঁ। তুমি নিখিলেশ। আর তুমি জিতেন্দ্রনাথ? তোমরা দুজন সল্লা করে দরখাস্ত করেছ?"

ব্যোমকেশ বলিল, "আজ্ঞে, আমি ওঁকে চিনি না।"

কর্তা কহিলেন, "বটে! চেনো না? কিন্তু দরখাস্ত পড়ে আমার অন্য রকম মনে হয়েছিল। যা হোক, তুমি এম, এস, সি পাশ করেছ?"

ব্যোমকেশ বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

"কোন য়ুনিভার্সিটি থেকে?"

"ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি থেকে।"

"হুঁ। টেবিলের উপর হইতে একখানা মোটা বই তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা খুলিয়া কহিলেন, "কোন সালে পাশ করেছ?"

সভয়ে দেখিলাম, বইখানা য়ুনিভার্সিটি কর্তৃক মুদ্রিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকা। আমার কপাল ঘামিয়া উঠিল। এই রে! এবার বুঝি সব ফাঁসিয়া যায়।

ব্যোমকেশ কিন্তু নিষ্কম্প স্বরে কহিল, “আজ্ঞে, এই বছর। মাসখানেক আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে।”

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যাক, একটা ফাঁড়া তো কাটিল, এ বছরের নামের তালিকা এখনও বাহির হয় নাই।

কর্তা ব্যর্থ হইয়া বই রাখিয়া দিলেন। তারপর অরও কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পর কঠোর জেরা চলিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে টলাইতে পারিলেন না। শর্টহ্যাণ্ড পরীক্ষাতেও যখন সে সহজে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন কর্তা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বেশ। তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলতে পারে। তুমি বসো।”

ব্যোমকেশ বসিল। কর্তা কিয়ৎ কাল ভ্রূকুটি করিয়া টেবিলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর হথাৎ আমার পানে মুখ তুলিয়া বলিলেন, “অজিতবাবু!”

“আজ্ঞে!”

বোমা ফাটার মতো হাসির শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, অদম্য হাসির তোড়ে কর্তার বিশাল দেহ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। অকস্মাৎ এত আনন্দের কি কারণ ঘটিল বুঝিতে না পারিয়া ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া দেখি, সে ভরৎসনা পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে, তখন বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অনুশোচনায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। হায় হায়, মুহূর্তের অসাবধানতায় সব নষ্ট করিয়া ফেলিলাম।

সীমান্ত-হীরা ০৩

কর্তার হাসি সহজে থামিল না, কড়ি বরগা কাঁপাইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া একাদিক্রমে চলিতে লাগিল। তারপর চক্ষু মুছিয়া আমার মৃয়মাণ মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি বলিলেন, "লজ্জিত হয়ো না। আমার কাছে ধরা পড়া তোমাদের পক্ষে কিছুমাত্র লজ্জার কথা নয়। কিন্তু বালক হয়ে তোমরা আমাকে ঠকাবে মনে করেছিলে, এতেই আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।"

আমরা নির্বাক হইয়া রহিলাম। কর্তা ব্যোমকেশের মাথার দিকে কিছুক্ষণ চক্ষু রাখিয়া বলিলেন, "ব্যোমকেশবাবু, তোমার কাছ থেকে আমি এতটা নির্বুদ্ধিতা প্রত্যাশা করিনি। তুমি ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তোমার করোটির গঠন থেকে বুঝতে পারছি তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে।"

ব্যোমকেশের মুণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন, "খুলির মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন আউন্স ব্রেন ম্যাটার আছে। তবে ব্রেন ম্যাটার থাকলেই শুধু হয় না, কনভল্যুশনের উপর সব নির্ভর করে। ... হনু আর চোয়াল উঁচু মৃদঙ্গ মুখ, বাঁকা নাক, হুঁ। ত্বরিতকর্মা, কূতবুদ্ধি, একগুঁয়ে। ইনট্যুশন খুব বেশি; রিজনিং পাওয়ার মন্দ ডেভেলপড নয় কিন্তু এখনও ম্যাচিয়োর করে নি। তবে মোটের উপর বুদ্ধির বেশ শৃঙ্খলা আছে – বুদ্ধিমান বলা চলে।"

আমার মনে হইল, জীবন্ত ব্যোমকেশের শব ব্যবচ্ছেদ হইতেছে, তাহার মস্তিষ্ককে কাটিয়া চিরিয়া ওজন করিয়া তাহার মূল্য নির্ণয় করা হইতেছে এবং আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছি।

স্বগত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কর্তা বলিলেন, "আমার মাথায় কতখানি মস্তিষ্ক আছে জানো? ষাট আউন্স – তোমার চেয়ে পাঁচ আউন্স বেশি। অর্থাৎ বনমানুষে আর সাধারণ মানুষে বুদ্ধির যতখানি তফাত তোমার সঙ্গে আমার বুদ্ধির তফাত তার চেয়েও বেশি।"

ব্যোমকেশ নিশ্চল হইয়া বসিয়া হরিল, তাহার মুখে কোনও বিকার দেখা গেল না। কর্তা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তারপর হথাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "খোকা তোমাকে পাঠিয়েছে একটা জিনিস চুরি করবার জন্য। কিন্তু তুমি পারবে বলে মনে হয়?"

এবারও ব্যোমকেশ কোনও উত্তর করিল না। তাহার নির্বিকার নীরবতা লক্ষ করিয়া কর্তা শ্লেষ করিয়া কহিলেন, "কি হে ব্যোমকেশবাবু, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যে। বলি, এত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েছ, পুরুত সেজে ঠাকুর চুরি করতে ঢুকেছ – তা কি রকম মনে হচ্ছে? পারবে চুরি করতে?"

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে কহিল, "সাত দিনের মধ্যে কুমার বাহাদুরের জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দেব কথা দিয়ে এসেছি।"

কর্তার ভীষণ মুখ ভীষণতর আকার ধারণ করিল, ঘন রোমশ ভ্রুযুগল কপালের উপর যেন তাল পাকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "বটে, বটে! তোমার সাহস তো কম নয় দেখছি। কিন্তু কি করে কাজ হাসিল করবে শুনি? এখনই তো তোমাদের ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেব। তারপর?"

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনার কথা থেকে একটা সংবাদ পাওয়া গেল, হীরাটা বাড়িতেই আছে।"

আরক্ত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া কর্তা বলিলেন, "হঁযা, আছে। কিন্তু তুমি পারবে খুঁজে নিতে? তোমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে কি?"

ব্যোমকেশ কেবল একটু হাসিল।

মনে হইল, এইবার বুঝি ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিবে। কর্তার কপালের শিরাগুলো ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল, দুই চক্ষে অন্ধ জিঘাংসা জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। হাতের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছু থাকিলে ব্যোমকেশের একটা রিষ্টি উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। ভাগ্যক্রমে সেরূপ কিছু ছিল না। তাই, সিংহ যেমন করিয়া কেশর নাড়া দেয়, তেমনি ভাবে মাথা নাড়িয়া কর্তা কহিলেন, "দেখ ব্যোমকেশবাবু, তুমি মনে কর তোমার ভারি বুদ্ধি, না? তোমার মতো ডিটেকটিভ দুনিয়ায় আর নেই? তুমি বাংলাদেশের বার্তিল? বেশ। তোমাকে তাড়াব না। এই বাড়ির মধ্যে যাতায়াত করবার অবাধ অধিকার তোমায় দিলাম। যদি পার, খুঁজে বার কর সে জিনিস। সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবে কথা দিয়েছ না? তোমাকে সাত বছর সময় দিলাম, বার কর খুঁজে। এ্যাণ্ড বি ড্যামড।"

কর্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জন ছাড়িলেন, "উজরে সিং!"

উজরে সিং তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। কর্তা আমাদের নির্দেশ করিয়া কহিলেন, "এই বাবু দুটিকে চিনে রাখো। আমি বাড়িতে থাকি বা না থাকি এঁরা এ বাড়িতে যেখানে ইচ্ছে যেতে পরেন, বাধা দিও না, বুঝলে? যাও।"

উজরে সিং তাহার নির্বিকার নেপালি মুখ ও তীর্যক চক্ষু আমাদের দিকে একবার ফিরাইয়া "যো হুকুম' বলিয়া প্রস্থান করিল।

কর্তা এবার রঘুবংশের কুম্ভোদর নামক সিংহের মতো হাস্য করিলেন, বলিলেন, "খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি – বুঝলে হে ব্যোমকেশচন্দ্র?"

"আজ্ঞে শুধু ব্যোমকেশ – চন্দ্র নেই।"

"না থাক। কিন্তু বুড়ো হয়ে মরে যাবে, তবু সে জিনিস পাবে না, বুঝলে? দিগিন রায় যে জিনিস লুকিয়ে রাখে, সে জিনিস খুঁজে বার করা ব্যোমকেশ বক্সীর কর্ম নয়। – ভালো কথা, আমার লোহার সিন্দুক ইত্যাদির চাবি যখন দরকার হবে, চেয়ে নিও। তাতে অবশ্য অনেক দামি জিনিস আছে, কিন্তু তোমার ওপর আমার অবিশ্বাস নেই। আমি এখন আমার স্টুডিওতে চললাম – আমাকে আজ আর বিরক্ত করো না। – আর একটা বিষয়ে তোমাদের সাবধান করে দিই, – আমার বাড়িময় অনেক বহুমূল্য ছবি আর প্ল্যাস্টারের মূর্তি ছড়ানো আছে, হিরে খোঁজার আগ্রহে সেগুলো যদি কোনও রকমে ভেঙে নষ্ট কর, তাহলে সেই দণ্ডেই কান ধরে বার করে দেব। যে সুযোগ পেয়েছ, তাও হারাবে।"

এইরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া স্যর দিগিন্দ্র ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দু'জনে মুখোমুখি কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

বুড়ার সহিত সংঘর্ষে ব্যোমকেশও ভিতরে ভিতরে বেশ কাবু হইয়াছিল, তাই ফ্যাকাসে গোছের একটু হাসিয়া বলিল, "চল, বাসায় ফেরা যাক। আজ আর কিছু হবে না।"

অন্যকে ঠকাইতে গিয়া নিজে ঠকিয়া অপদস্থ হওয়ার লজ্জা অল্পই আছে। তাই পরাজয় ও লাঞ্ছনার গ্লানি বহিয়া নীরবে বাসায় পৌঁছিলাম। দু'পেয়ালা করিয়া চা গলাধঃকরণ করিবার পর মন কতকটা চাঙ্গা হইলে বলিলাম, "ব্যোমকেশ, আমার বোকামিতেই সব মাটি হল।"

ব্যোমকেশ বলিল, "বোকামি অবশ্য তোমার হয়েছে, কিন্তু সে জন্য ক্ষতি কিছু হয়নি। বুড়ো আগে থাকতেই সব জানতো। মনে আছে – ট্রেনের সেই ভদ্রলোকটি? যিনি পরের স্টেশনে নেমে যাবেন বলে পাশের গাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন? তিনি এরই গুপ্তচর। বুড়ো আমাদের নাড়ি নক্ষত্র সব জানে।"

"খুব বাঁদর বানিয়ে ছেড়ে দিলে যা হোক। এমনটা আর কখনও হয়নি।"

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল, "বুড়োর ঐ মারাত্মক দুর্বলতাটুকু ছিল বলেই রক্ষে, নইলে হয়তো হাল ছেড়ে দিয়ে হত।"

আমি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলাম, "কি রকম? তোমার কি এখনও আশা আছে না কি?"

"বিলক্ষণ! আশা আছে বৈ কি। তবে বুড়ো যদি সত্যিই ঘাড় ধরে বার করে দিত তাহলে কি হত বলা যায় না। যা হোক, বুড়োর একটা দুর্বলতার সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন ঐ থেকেই কার্যসিদ্ধি করতে হবে।"

"কোন দুর্বলতার সন্ধান পেলে শুনি! আমি তো বাবা কোথাও এতটুকু ছিদ্র পেলুম না, একেবারে নিরেট নিভাঁজ, লোহার মতো শক্ত।"

"কিন্তু ছিদ্র আছে, বেশ বড় রকম ছিদ্র এবং সেই ছিদ্র পথেই আমরা বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। কি জানি কেন, বড় লোকের মধ্যেই এই দুর্বলতা সব চেয়ে বেশি দেখা যা। যার যত বেশি বুদ্ধি, বুদ্ধির অহঙ্কার তার চতুর্গুণ। ফলে বুদ্ধি থেকেও কোন লাভ হয় না।"

"হেঁয়ালিতে কথা কইছো। একটু পরিষ্কার করে বলো।"

"বুড়োর প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে বুদ্ধির অহঙ্কার। সেটা গোড়াতে বুঝে নিয়েছিলুম বলেই সেই অহঙ্কারে ঘা দিয়ে কাজ হাসিল করে নিয়েছি। বাড়িতে যখন ঢুকতে পেরেছি, তখন তো আট আনা কাজ হয়ে গেছে। এখন বাকি শুধু হিরেটা খুঁজে বার করা।"

"তুমি কি আবার ও বাড়িতে মাথা গলাবে না কি?"

"আলবত গলাব। বল কি,এত বড় সুযোগ ছেড়ে দেব?"

এবার গেলেই ঐ বেটা উজরে সিং পেটের মধ্যে কুকরি পুরে দেবে। যা হয় করো, আমি আর এর মধ্যে নেই।"

হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, "তা কি হয়, তোমাকেও চাই এক যাত্রায় পৃথক ফল কি ভালো?"

পরদিন একটু সকাল সকাল স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিনা টিকিটে রেলে চড়িতে গেলে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, সেই রকম ভয়ে ভয়ে বাড়ির সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু দরোয়ানরা কেহ বাধা দিল না: উজরে সিং আজ আমাদের দেখিয়া যেন দেখিতে পাইল না। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞসা করিয়া জানিতে পারিল যে, গৃহস্বামী স্টুডিওতে আছেন।

অতঃপর আমাদের রত্ন অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এত বড় বাড়ির মধ্যে সুপারির মতো একখণ্ড জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিবার দুঃসাহস এক ব্যোমকেশেরই থাকিতে পারে, অন্য কেহ হইলে কোনকালে নিরুৎসাহ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিত। খড়ের গাদার মধ্য হইতে ছুঁচ খুঁজিয়া বাহির করাও বোধ করি ইহার তুলনায় সহজ। প্রথমত, মূল্যবান জিনিসপত্র লোক যেখানে রাখে অর্থাৎ আলমারি কি সিন্দুকে অনুসন্ধান করা বৃথা। বুড়া অতিশয় ধূর্ত – সে জিনিস সেখানে রাখিবে না। তবে কোথায় রাখিয়াছে? এডগার এ□য়ালেন পো'র একটা গল্প বহুদিন পূর্বে পড়িয়াছিলাম মনে পড়িল। তাহাতেও এমনই কি একটা দলিল খোঁজাখুঁজির ব্যাপার ছিল। শেষে বুঝি নিতান্ত প্রকাশ্য স্থান হইতে সেটা বাহির হইয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ কিন্তু অলস কল্পনায় সময় কাটাইবার লোক নয়। সে রীতিমত খানাতল্লাস শুরু করিয়া দিল। দেয়ালে টোকা মারিয়া কোথাও ফাঁপা আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। বড় বড় পুস্তকের আলমারি খুলিয়া প্রত্যেকটি বই নামাইয়া পরীক্ষা

করিল। স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িখানা চিত্র ও মূর্তির একটা কলা-ভবন (গ্যালারি) বলিলেই হয়, ঘরে ঘরে নানা প্রকার সুন্দর ছবি ও মূর্তি প্ল্যাস্টার কাস্ট সাজানো রহিয়াছে, অন্য আসবাব খুব কম। সুতরাং মোটামুটি অনুসন্ধান শেষ করিতে দুই ঘন্টার বেশি সময় লাগিল না। সর্বত্র বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে আমরা গৃহস্বামীর স্টুডিও ঘরে গিয়া হানা দিলাম।

দরজায় টোকা মারিতেই ভিতর হইতে গম্ভীর গর্জন হইল, "এসো।"

সীমান্ত-হীরা ০৪

ঘরটা বেশ বড়, তাহার এক দিকের সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া লম্বা একটা টেবিল চলিযা গিযাছে। টেবিলের উপর নানা চেহারার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজানো রহিয়াছে। আমরা প্রবেশ করিতেই স্যর দিগিন্দ্র হুঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “কি হে ব্যোমকেশবাবু, পরশ মাণিক পেলে? তোমাদের কবি লিখেছেন না, ‘ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর’? তোমার দশাও সেই ক্ষ্যাপার মতো হবে দেখছি, শেষ পর্যন্ত মাথায় বৃহৎ জটা গজিয়ে যাবে।”

ব্যোমকেশ বলিল, “আপনার লোহার সিন্দুকটা একবার দেখব মনে করেছি।”

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন, “বেশ বেশ। এই নাও চাবি, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম; কিন্তু এই প্ল্যাস্টার কাস্টটা ঢালাই করতে একটু সময় লাগবে। যা হোক, অজিতবাবু তোমার সাহায্য করতে পারবেন। আর যদি দরকার হয়, উজরে সিং -”

তাঁহার শ্লেষোক্তিতে বাধা দিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,”ওটা আপনি কি করছেন?”

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন, “আমার তৈরি নটরাজ মূর্তির নাম শুনেছ তো? এটা তারই একটা ছোট প্ল্যাস্টার কাস্ট তৈরি করছি। আর একটা আমার টেবিলের উপর রাখা আছে, দেখে থাকবে। কাগজ চাপা হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয় – কি বল?”

মনে পড়িল, স্যর দিগিন্দ্রের বসিবার ঘরে টেবিলের উপর একটি অতি সুন্দর ছোট নটরাজ মহাদেবের মূর্তি দেখিয়াছিলাম। ওটা তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু উহাই যে স্যর দিগিন্দ্রের নির্মিত বিখ্যাত মূর্তির মিনিয়েচার, তাহা তখন কল্পনা করি নাই।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, “ঐ মূর্তিটাই আপনি প্যারিসে একজিবিট করিয়েছিলেন!” স্যর দিগিন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন, “হঁযা। আসল মূর্তিটা পাথরের গড়া – সেটা এখনও ল্যুভরে আছে।”

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। লোকটার সর্বতোমুখী অসামান্যতা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল; তাই ব্যোমকেশ যখন সিন্দুক খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল, আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত বড় একটা প্রতিভার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ের আশা কোথায়?

অনুসন্ধান শেষ করিয়া ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছড়িয়া বলিল, “নাঃ, কিছু নেই। চল, বাইরের ঘরে একটু বসা যাক।”
বসিবার ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম স্যর দিগিন্দ্র ইতিমধ্যে আসিয়া বসিয়াছেন এবং মুখের অনুযায়ী একটি স্থূল চুরুট দাঁতে চাপিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন। আমরা বসিলে তিনি ব্যোমকেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, “পেলে না? আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই। একটু জিরিয়ে নাও, তারপর আবার খুঁজো।” ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চাবির গোছা ফেরত দিল; সেটা পকেটে ফেলিয়া আমার পানে ফিরিয়া স্যর দিগিন্দ্র কহিলেন, “ওহে অজিতবাবু, তুমি তো গল্প টল্প লিখে থাকো; সুতরাং একজন বড় দরের আর্টিস্ট! বলো দেখি এ পুতুলটি কেমন?” বলিয়া সেই নটরজ মূর্তিটি আমার হাতে দিলেন।

ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং ইঞ্চি তিনেক চওড়া মূর্তিটি। কিন্তু ঐটুকু পরিসরের মধ্যে কি অপূর্ব শিল্প প্রতিভাই না প্রকাশ পাইয়াছে! নটরাজের প্রলয়ঙ্কর নৃত্যোন্মাদনা যেন ঐ ক্ষুদ্র মূর্তির

প্রতি অঙ্গ অঙ্গ হইতে মথিত হইয়া উঠিতেছে। কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিবার পর আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইল, "চমৎকার! এর তুলনা নেই।"

ব্যোমকেশ নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এটাও কি আপনি নিজে মোল্ড করেছেন?"

একরাশি দূম উদ্গীর্ণ করিয়া স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন, "হ্যাঁ। আমি ছাড়া আর কে করবে?"

ব্যোমকেশ মূর্তিটা আমার হাত হইতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, "এ জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না বোধ হয়?"

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন, "না। কেন বল দেখি? পাওয়া গেলে কিনতে না কি?"

"বোধ হয় কিনতুম। আপনিই এই রকম প্ল্যাস্টার কাস্ট তৈরি করিয়ে বাজারে বিক্রি করেন না কেন? আমার বিশ্বাস এতে পয়সা আছে।"

"পয়সার যদি কখনও অভাব হয় তখন দেখা যাবে। আপাতত জিনিসটাকে বাজারে বিক্রি করে খেলো করতে চাই না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, "এখন তাহলে উঠি। আবার ও বেলা আসব।" বলিয়া মূর্তিটা ঠিক করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

স্যর দিগিন্দ্র চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি তো আচ্ছা বেকুব হে। এখনই ওটি ভেঙেছিলে!"

তারপর বাঘের মতো ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া রুদ্ধ গর্জনে বলিলেন, "তোমাদের একবার সাবধান করে দিয়েছি, আবার বলছি, আমার কোন ছবি বা মূর্তি যদি ভেঙেছ, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বার করে দেব, আর ঢুকতে দেব না। বুঝেছ?"

ব্যোমকেশ অনুতপ্তভাবে মার্জনা চাহিলে তিনি ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, "এইসব সুকুমার কলার অযত্ন আমি দেখতে পারি না। যা হোক ও বেলা তাহলে আবার আসচ? বেশ

কথা, উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহ; এবার বাড়ির কোন দিকটা খুঁজবে মনস্থ করেছ? বাগান কুপিয়ে যদি দেখতে চাও, তারও বন্দোবস্ত করে রাখতে পারি।”

বিদ্রূপবাণ বেবাক হজম করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। রাস্তায় পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, “চল, এতক্ষণে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি খুলেছে, একবার ওদিকটা ঘুরে যাওয়া যাক। একটু দরকার আছে।”

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়া ব্যোমকেশ বিলাতি বিশ্বকোষ হইতে প্ল্যাস্টার কাস্টিং অংশটা খুব মন দিয়া পড়িল। তারপর বই ফিরাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। লক্ষ করিলাম, কোনও কারণে সে বেশ একটু উত্তেজিত হইয়াছে। বাড়ি পৌঁছিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি হে, প্ল্যাস্টার কাস্টিং সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন?”

ব্যোমকেশ বলিল, “তুমি তো জানো, সকল বিষয়ে কৌতূহল আমার একটা দুর্বলতা।”

“তা তো জানি। কিন্তু কি দেখলে?”

“দেখলুম প্ল্যাস্টার কাস্টিং খুব সহজ, যে কেউ করতে পারে। খানিকটা প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস জলে গুলে যখন সেটা দইয়ের মতো ঘন হয়ে আসবে, তখন মাটির বা মোমের ছাঁচের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা জমে শক্ত হয়ে যাবে, তখন ছাঁচ থেকে বার করে নিলেই হয়ে গেল। ওর মধ্যে শক্ত যা কিছু ঐ ছাঁচটা তৈরি করা।”

“এই! তা এর জন্য এত দুর্ভাবনা কেন?”

“দুর্ভাবনা নেই। ছাঁচে প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস ঢালবার সময় যদি একটা সুপুরি কি ঐ জাতীয় কোনও শক্ত জিনিস সেই সঙ্গে ঢেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা মূর্তির মধ্যে রয়ে যাবে।”

“অর্থাৎ?”

কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল, “অর্থাৎ বুঝ লোক যে জান সন্ধান।”

বৈকালে আবার স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িতে গেলাম। এবারও তন্ন তন্ন করিয়া বাড়িখানা খোঁজা হইল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। স্যর দিগিন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া আমরা বসিবার ঘরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম, তখন তিনি আমাদের ভারি পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া চা ও জলখাবার আনাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি আতিথ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দিলেন। আমার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যোমকেশ একেবারে বেহায়া – সে অম্লানবদনে সমস্ত ভোজ্যপেয় উদরসাৎ করিতে করিতে অমায়িকভাবে স্যর দিগিন্দ্রের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

স্যর দিগিন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর কত দিন চালাবে? এখনও আশ মিটল না?”

ব্যোমকেশ বলিল, “আজ বুধবার। এখনও দু’দিন সময় আছে।”

স্যর দিগিন্দ্র অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ ভ্রুক্ষেপ না করিয়া টেবিলের উপর হইতে নটরাজের পুতুলটা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এটা কত দিন হল তৈরী করেছেন?”

ভ্রুকুটি করিয়া স্যর দিগিন্দ্র চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, “দিন পনের কুড়ি হবে। কেন?”

“না- অমনি। আচ্ছা, আজ উঠি। কাল আবার আসব। নমস্কার।” বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ি ফিরিতেই চাকর পুঁটিরাম একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিযা বলিল, "একজন তকমা পরা চাপরাসি দিয়ে গেছে।"

খামের ভিতর শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড, তাহার এক পিঠে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে, কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায়। অন্য পিঠে পেনসিল দিয়া লেখা, "এইমাত্র কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। কত দূর?"

ব্যোমকেশ কার্ডখানা টেবিলের এক পাশে রাখিয়া দিয়া আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িল; কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিল। কুমার বাহাদুর হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে মনে মনে খুশি হয় নাই বুঝিলাম। প্রশ্ন করাতে সে বলিল, "এক পক্ষের উৎকণ্ঠা অনেক সময় অন্য পক্ষে সঞ্চারিত হয়। কুমার বাহাদুরের আসার ফলে বুড়ো যদি ভয় পেয়ে মতলব বদলায়, তা হলেই সব মাটি। আবার নতুন করে কাজ আরম্ভ করতে হবে।"

সমস্ত সন্ধ্যাটা সে একভাবে আরাম চেয়ারে পড়িয়া রহিল। রাত্রে আমরা দু'জনে একই ঘরে দুইটি পাশাপাশি খাটে শয়ন করিতাম, বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ গল্প চলিত। আজ কিন্তু ব্যোমকেশ একটা কথাও কহিল না। আমি কিছুক্ষণ এক তরফা কথা কহিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে আমি, ব্যোমকেশ ও স্যর দিগিন্দ্র হীরার মার্বেল দিয়া গুলি খেলিতেছি, মার্বেলগুলি ব্যোমকেশ সমস্ত জিতিয়া লইয়াছি, স্যর দিগিন্দ্র মাঠিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল।

চোখ খুলিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে আমার খাটের পাশে বসিয়া আছে। আমার নিশ্বাসের শব্দে বোধহয় বুঝিতে পারিল আমি জাগিয়াছি, বলিল, "দেখ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হিরেটা বসবার ঘরে টেবিলের উপর কোনখানে আছে।"

জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রি ক'টা?"

ব্যোমকেশ বলিল, "আড়াইটে। তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? বুড়ো বসবার ঘরে ঢুকেই প্রথমে টেবিলের দিকে তাকায়।"

আমি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলাম, "তাকাক, তুমি এখন চোখ বুজে শুয়ে পড় গে।"

ব্যোমকেশ নিজ মনেই বলিতে লাগিল, "টেবিলের দিকে তাকায় কেন? নিশ্চয় দেরাজের মধ্যে? না। যদি থাকে তো টেবিলের উপরই আছে। কি কি জিনিস আছে টেবিলের উপর? হাতির দাঁতের দোয়াতদান, টাইমপিস ঘড়ি, গঁদের শিশি, কতকগুলো বই, ব্লটিং প্যাড, সিগারের বাক্স, পিনকুশন, নটরাজ -"

শুনিতে শুনিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রে যতবার ঘুম ভাঙিল, অনুভব করিলাম ব্যোমকেশ অন্ধকারে ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

সকালে ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণকে একখানা চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। সংক্ষেপে জানাইল যে, চিন্তার কোনও কারণ নাই, শনিবার কোনও সময় দেখা হইবে।

তারপর আবার দুইজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, সারারাত্রি জাগরণের ফলে সে মনে মনে কোনও একটা সঙ্কল্প করিয়াছে।

সীমান্ত-হীরা ০৫

স্যর দিগিন্দ্র আজ বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া সাড়ম্বরে সম্ভাষণ করিলেন, "এই যে মাণিক জোড়, এসো এসো। আজ যে ভারি সকাল সকাল? ওরে কে আছিস, বাবুদের চা দিয়ে যা। ব্যোমকেশবাবুকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখছি! দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুম হয় নি বুঝি?"

ব্যোমকেশ টেবিল হইতে নটরাজের মূর্তিটি হাতে লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, "এই পুতুলটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। কাল সমস্ত রাত্রি এর কথা ভেবেই ঘুমোতে পারিনি।"

পূর্ণ এক মিনিটকাল দু'জনে পরস্পরের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নিঃশব্দে মনে মনে কি যুদ্ধ হইল বলিতে পারি না, এক মিনিট পরে স্যর দিগিন্দ্র সকৌতুকে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ব্যোমকেশ, তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি, অত সহজে এ বুড়োকে ঠকাতে পারবে না। ওটার জন্যে রাত্রে তোমার ঘুম হয়নি বলছিলে, বেশ তোমাকে ওটা আমি দান করলাম।"

ব্যোমকেশের হতবুদ্ধি মুখের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "কেমন? হল তো? কিন্তু মূর্তিটা দামি জিনিস, ভেঙে নষ্ট করো না।"

মুহূর্তমধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, "ধন্যবাদ।" বলিয়া মূর্তিটি রুমালে মুড়িয়া পকেটে পুরিল।

তারপর যথারীতি ব্যর্থ অনুসন্ধান করিয়া বেলা দশটা নাগাদ বাসায় ফিরিলাম। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, "নাঃ, ঠকে গেলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার বল তো? আমি তো তোমাদের কথাবার্তা ভাবভঙ্গি কিছুই বুঝতে পারলুম না।"

পকেট হইতে পুতুলটা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, "নানা কারণে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, এই নটরাজের ভিতরে হিরেটা আছে। ভেবে দেখ, এমন সুন্দর লুকোবার জায়গা আর হতে পারে কি? হিরেটা চোখের সামনে টেবিলের উপর রয়েছে, অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না। পুতুলটা স্যর দিগিন্দ্র নিজে ছাঁচে ঢালাই করেছেন, সুতরাং প্ল্যাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে হিরেটা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। তাতে স্যর দিগিন্দ্রের মনস্কামনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে হিরেটার প্রতি তাঁর এত ভালোবাসা, সেটা সর্বদা কাছে কাছে থাকে, অথচ কারুর সন্দেহ হয় না। আজ ঠিক করে বেরিয়েছিলুম যে পুতুলটা চুরি করব। যে দিক থেকেই দেখ, সমস্ত যুক্তি অনুমান ঐ পুতুলটার দিকে নির্দেশ করছে। তাই আমার নিঃসংশয় ধারণা হয়েছিল যে, হিরেটা আর কোথাও থাকতে পারে না। কিন্তু বুড়োর কাছে ঠকে গেলুম। শুধু তাই নয়, বুড়ো আমার মনের ভাব বুঝে বিদ্রূপ করে পুতুলটা আমায় দান করে দিলে! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে বুড়ো এক নম্বর। মোটের উপর আমার থিয়োরিটাই ভেস্তে গেল। এখন আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু সময়ও তো আর নেই। মাঝে মাত্র একদিন।"

ব্যোমকেশ পুতুলটার নীচে পেন্সিল দিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরে নিজের নামের আদ্যক্ষরটা লিখিতে লিখিতে বলিল, "মাত্র একদিন। বোধ হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল না। এদিকে কুমার বাহাদুর এসে হানা দিয়ে বসে আছেন। হাঃ, বুড়ো সব দিক দিয়েই হাস্যাস্পদ করে দিলে।

লাভের মধ্যে দেখছি কেবল এই পুতুলটা!” মুখের একটা ভঙ্গি করিয়া ব্যোমকেশ মূর্তিটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, তারপর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বৈকালে নিয়মমতো স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িতে গেলাম। শুনিলাম কর্তা এইমাত্র বাহিরে গিয়াছেন। ব্যোমকেশ তখন নতুন পথ ধরিল, আমাকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া উজরে সিং থাপার সহিত ভাব জমাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। আমি একাকী বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম; ব্যোমকেশ ও উজরে সিং বারান্দায় দুই টুলে বসিয়া অমায়িকভাবে আলাপ করিতেছে, মাঝে মাঝে চোখে পড়িতে লাগিল। ব্যোমকেশ ইচ্ছা করিলে খুব সহজে মানুষের মন ও বিশ্বাস জয় করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু উজরে সিং থাপার পাহাড়ী হৃদয় গলাইয়া তাহার পেট হইতে কথা বাহির করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে আবার যখন দু’জনে পথে বাহির হইলাম, তখন ব্যোমকেশ বলিল, “কিছু হল না। উজরে সিং লোকটি হয় নিরেট বোকা, নয় আমার চেয়ে বুদ্ধিমান।”

বাসায় ফিরিয়া আসিলে চাকর খবর দিল যে একটি লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল, আমাদের আশায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া আবার আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে বলিল, “কুমার বাহাদুরের পেয়াদা।”

এই ব্যর্থ ঘোরাঘুরি ও অণ্বেষণে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম, “আর কেন ব্যোমকেশ, ছেড়ে দাও। এ যাত্রা কিছু হল না। কুমার সাহবকেও জবাব দিয়ে দাও, মিছে তাঁকে সংশয়ের মধ্যে রেখে কোনও লাভ নেই।”

টেবিলের সম্মুখে বসিয়া নটরাজ মূর্তিটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে মৃয়মাণ কণ্ঠে ব্যোমকেশ বলিল, "দেখি, কালকের দিনটা এখনও হাতে আছে। যদি কাল সমস্ত দিনে কিছু না করতে পারি- "

তাহার মুখের কথা শেষ হইল না। চোখ তুলিয়া দেখি, তাহার মুখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে নিষ্পলক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নটরাজ মূর্তিটার দিকে তাকাইয়া আছে।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হল?"

ব্যোমকেশ কম্পিতহস্তে মূর্তিটা আমার চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "দেখ দেখ – নেই। মনে আছে, আজ সকালে পেনসিল দিয়ে পুতুলটার নীচে একটা 'ব' অক্ষর লিখেছিলুম? সে অক্ষরটা নেই।"

দেখিলাম সত্যিই অক্ষরটা নাই। কিন্তু সেজন্য এত বিচলিত হইবার কি অছে? পেনসিলের লেখা – মুছিয়া যাইতেও তো পারে।"

ব্যোমকেশ বলিল, "বুঝতে পারছ না? বুঝতে পারছ না?" হঠাৎ সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "উঃ, বুড়ো কি ধাপ্পাই দিয়েছে! একেবারে উল্লুক বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল হে! যা হোক, বাঘেরও ঘোগ আছে। – পুঁটিরাম।"

ভৃত্য পুঁটিরাম আসিলে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, "যে লোকটি আজ এসেছিল, তাকে কোথায় বসিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে এই ঘরে।"

"তুমি বরাবর এ ঘরে ছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ। তবে মাঝে তিনি এক গ্লাস জল চাইলেন, তাই – "

"আচ্ছা – যাও।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া হাসিতে লাগিল, তারপর উঠিয়া পাশের ঘরে যাইতে যাইতে বলিল, "তুমি শুনে হয়তো আশ্চর্য হবে, হিরেটা আজ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এই টেবিলের উপর রাখা ছিল।"

আমি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। বলে কি? হঠাৎ মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি?

পশের ঘর হইতে ব্যোমকেশ ফোন করিতেছে শুনিতে পাইলাম – "কুমার ত্রিদিবেন্দ্র? হ্যাঁ, আমি ব্যোমকেশ। কাল বেলা দশটা মধ্যে পাবেন। আপনার স্পেশাল ট্রেন যেন ঠিক থাকে। পাবামাত্র রওনা হবেন। না না, এখানে থাকা বোধ হয় নিরাপদ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ও সব কথা পরে হবে। ভুলবেন না সাড়ে দশটার মধ্যে কলকাতা ছাড়া চাই। আচ্ছা, আপনার কিছু করে কাজ নেই – স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত আমি করে রাখব। কাউকে কিছু বলবেন না; না আপনার সেক্রেটারিকেও নয়, আচ্ছা নমস্কার।"

তারপর হ্যাটকোট পরিয়া বোধ করি স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইল। 'ফিরতে রাত হবে – তুমি শুয়ে পোড়ো' আমাকে শুধু এইটুকু বলিয়া গেল।

রাত্রে ব্যোমকেশ কখন ফিরিল, জানিতে পারি নাই। সকালে সাড়ে আটটার সময় যথারীতি দু'জনে বাহির হইলাম। বাহির হইবার সময় দেখিলাম, নটরাজ মূর্তিটা যথাস্থানে নাই। সেদিকে ব্যোমকেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে বলিল, "আছে। সেটাকে সরিয়ে রেখেছি।"

স্যর দিগিন্দ্র তাঁহার বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "তোমাদের দৈনিক আক্রমণ আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। এমন কি, যতক্ষণ তোমরা আসনি, একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল।"

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল, "আপনার উপর অনেক জুলুম করেছি, কিন্তু আর করব না, এই কথাটি আজ জানাতে এলুম। জয় পরাজয় এক পক্ষের আছেই, সে জন্য দুঃখ করা মূঢ়তা। কাল থেকে আর আমাদের দেখতে পাবেন না। আপনি অবশ্য জানেন যে, আপনার ভাইপো এখানে গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে আছেন – তাঁকে কাল একরকম জানিয়েই দিয়েছি যে তাঁর এখানে থেকে আর কোনও লাভ নেই। আজ তাঁকে শেষ জবাব দিয়ে যাব।"

স্যর দিগিন্দ্র কিছুক্ষণ কুঞ্চিত চক্ষে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিলেন; ক্রমে তাঁহার মুখে সেই বুলডগ হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, "তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে খুশি হলাম। খোকাকে বোলো বৃথা চেষ্টা করে যেন সময় নষ্ট না করে।"

"আচ্ছা বলব।" টেবিলের উপর আর একটি নটরাজ মূর্তি রাখা হইয়াছে দেখিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, "এই যে আর একটা তৈরি করেছেন দেখছি। আপনার উপহারটি আমি যত্ন করে রেখেছি; শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, আপনার স্মৃতি চিহ্ন হিসাবেও আমার কাছে তার দাম অনেক। কিন্তু যদি কখনও দৈবাৎ ভেঙে যায়, আর একটা পাব কি?"

স্যর দিগিন্দ্র প্রসন্নভাবে বলিলেন, "বেশ, যদি ভেঙে যায়, আর একটি পাবে। আমার বাড়িতে ঢুকে তোমার শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে এটাও কম লাভ নয়।"

গভীর বিনয় সহকারে ব্যোমকেশ বলোক, "আজ্ঞে হঁ্যা। এত দিন আমার মনের ওদিকটা একেবারে পর্দা ঢাকা ছিল। কিন্তু এই ক'দিন আপনার সংসর্গে এসে ললিত কলার রস পেতে আরম্ভ করেছি, বুঝেছি, ওর মধ্যে কি অমূল্য রত্ন লুকোনো আছে – ঐ ছবিখানাও আমার বড় ভালো লাগে। ওটা কি আপনারই আঁকা?"

স্যর দিগিন্দ্রের পশ্চাতে দেয়ালের গায়ে একটা সুন্দর নিসর্গ দৃশ্যের ছবি টাঙানো ছিল, ব্যোমকেশ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

মুহূর্তের জন্য স্যর দিগিন্দ্র ঘাড় ফিরাইলেন। সেই ক্ষণিক অবকাশে ব্যোমকেশ এক অদ্ভুত হাতের কসরত দেখাইল। টিকটিকি যেমন করিয়া শিকার ধরে, তেমনি ভাবে তাহার একটা হাতে টেবিলের উপর হইতে নটরাজ মূর্তিটি তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল এবং অন্য হাতটা সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নটরাজ মূর্তি তাহার স্থানে বসাইয়া দিল। স্যর দিগিন্দ্র যখন আবার সম্মুখে ফিরিলেন, তখন ব্যোমকেশ পূর্ববৎ মুগ্ধভাবে দেয়ালের ছবিটার দিকে চাহিয়া আছে।
আমার বুকের ভিতরটা এমন অসম্ভব রকম ধড়ফড় করিতে লাগিল যে, স্যর দিগিন্দ্র যখন সহজ কণ্ঠে বলিলেন, “হঁযা, ওটা আমারই আঁকা,” তখন কথাগুলো আমার কানে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দূরাগত বলিয়া মনে হইল। ভাগ্যে সে সময় তিনি আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নতুবা ব্যোমকেশের হাতের কসরত হয় তো আমার মুখের উদ্বেগ হইতেই ধরা পড়িয়া যাইত।

ব্যোমকেশ ধীরে সুস্থে উঠিয়া বলিল, “এখন তাহলে আসি। আপনার সংসর্গে এসে আমার লাভই হয়েছে, এ কথা আমি কখনও ভুলব না। আশা করি, আপনিও আমাদের ভুলতে পারবেন না। যদি কখনও দরকার হয়, মনে রাখবেন, আমি একজন সত্যান্বেষী, সত্যের অনুসন্ধান করাই আমার পেশা। চল অজিত। আচ্ছা, চললুম তবে, নমস্কার।”

দরজার নিকট হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলাম স্যর দিগিন্দ্র ভ্রুকুটি করিয়া সন্দেহ প্রখর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন, যেন ব্যোমকেশের কথার কোন একটা অতি গূঢ় ইঙ্গিত বুঝি বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না।

বাড়ির বাহিরে আসিতেই একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল; তাহাতে চাড়িয়া বসিয়া ব্যোমকেশ হুকুম দিল, “গ্র্যাণ্ড হোটেল।”

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, “ব্যোমকেশ, এসব কি কাণ্ড?”

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, “এখনও বুঝতে পারছ না, এই আশ্চর্য। আমি যে অনুমান করেছিলুম হিরেটা নটরাজের মধ্যে আছে, তা ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম। বুড়ো বুঝতে পেরে আমাকে ধোঁকা দেবার জন্যে পুতুলটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। তারপর আর একটা ঠিক ঐ রকম মূর্তি তৈরি করে কাল সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আসলটার সঙ্গে বদল করে এনেছিল। যদি এই অস্পষ্ট ‘ব’ অক্ষরটি লেখা না থাকত, তাহলে আমি জানতেও পারতুম না।” বলিয়া পুতুলটা উল্টাইয়া দেখাইল। দেখিলাম, পেন্সিলে লেখা অক্ষরটি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, “কাল যখন এই ‘ব’ অক্ষরটি যথাস্থানে দেখতে পেলুম না, তখন এক নিমেষে সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ প্রথমে গিয়েই বুড়োর টেবিল থেকে নটরাজটি উলটে দেখলুম, আমার সেই ‘ব’ মার্কা নটরাজ। অন্য মূর্তিটা পকেটেই ছিল। ব্যস! তারপর হাত সাফাই তো দেখতেই পেলে।”

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম, “তুমি ঠিক জানো, হিরেটা ওর মধ্যেই আছে?”

“হ্যাঁ। ঠিক জানি, কোন সন্দেহ নেই।”

“কিন্তু যদি না থাকে?”

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল, "তাহলে বুঝব, পৃথিবীতে সত্য বলে কোনও জিনিস নেই। শাস্ত্রের অনুমান খণ্ডটা একেবারে মিথ্যা।"

গ্র্যাণ্ড হোটেলে কুমার ত্রিদিবেন্দ্র একটা আস্ত স্যুট ভাড়া করিয়া ছিলেন, আমরা তাঁহার বসিবার ঘরে পদার্পণ করিতেই তিনি দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিলেন, "কি? কি হল, ব্যোমকেশবাবু?"

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে নটরাজ মূর্তিটি টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

হতবুদ্ধিভাবে কুমার বাহাদুর বলিলেন, "এটা তো দেখছি কাকার নটরাজ, কিন্তু আমার সীমন্ত হীরা – "

"ওর মধ্যেই আছে।"

"ওর মধ্যে?"

"হ্যাঁ, ওরই মধ্যে। কিন্তু আপনার যাবার বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে তো? সাড়ে দশটার সময় আপনার স্পেশাল ছাড়বে।"

কুমার বাহাদুর অস্থির হইয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। ওর মধ্যে আমার সীমন্ত হীরা আছে, কি বলছেন?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, পরীক্ষা করে দেখুন।"

একটা পাথরের কাগজ চাপা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ মূর্তিটার উপর সজোরে আঘাত করিতেই সেটা বহু খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল।

"এই নিন আপনার সীমন্ত হীরা।" ব্যোমকেশ হীরাটা তুলিয়া ধরিল, তাহার গায়ে তখনও প্ল্যাস্টার জুড়িয়া আছে, কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ওটা সত্যই হীরা বটে।

কুমার বাহাদুর ব্যোমকেশের হাত হইতে হীরাটা প্রায় কাড়িয়া লইলেন; কিছুক্ষণ একাগ্র নির্নিমেষ দৃষ্টিতে হাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, "হঁযা, এই আমার সীমন্ত হীরা। এই যে এর ভিতর থেকে নীল আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব -"

"কিছু বলতে হবে না, আপাতত যত শীঘ্র পারেন বেরিয়ে পড়ুন। খুড়োমশাই যদি ইতিমধ্যে জানতে পারেন, তাহলে আবার হীরা হারাতে কতক্ষণ?"

"না না, আমি এখনই বেরুচ্ছি। কিন্তু আপনার -"

কুমার বাহাদুরকে স্টেশনে রওনা করিয়া দিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। আরাম কেদারায় অঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া ব্যোমকেশ পরম সার্থকতার হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি শুধু ভাবছি, বুড়ো যখন জানতে পারবে, তখন কি করবে?"

দিন কয়েক পরে কুমার বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি ইন্সিওর করা খাম আসিল। চিঠির সঙ্গে একখানি চেক পিন দিয়া আঁটা। চেক-এ অঙ্কের হিসাবটা দেখিয়া চক্ষু ঝলসিয়া গেল। পত্রখানি এইরূপ –

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু,

আমার চিরন্তন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যাহা পাঠাইলাম, জানি আপনার প্রতিভার তাহা যোগ্য নহে। তবু, আশা করি আপনার অমনোনীত হইবে না। ভবিষ্যতে আপনার সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় রহিলাম। এবার যখন কলিকাতায় যাইব, আপনার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিব।

অজিতবাবুকেও আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তিনি সাহিত্যিক, সুতরং টাকার কথা তুলিয়া তাঁহার সারস্বত সাধনার অমর্যাদা করিতে চাই না। [হায় রে পোড়াকপালে সাহিত্যিক!] কিন্তু যদি তিনি নাম ধাম বদল করিয়া এই হীরা হরণের গল্পটা লিখিতে পরেন, তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি নাই জানিবেন। শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

ইতি

প্রতিভামুগ্ধ

শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায়